গ্রন্থ পর্যালোচনা

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৪১ বার্ষিক সংখ্যা ১৪৩০

স্মৃতি মঞ্জুষা: এক মহীয়সী নারীর জীবন সংগ্রামের অনবদ্য আখ্যান

বিমল কুমার সাহা*

"আমাদের জীবনটাই হচ্ছে সর্বগ্রাসী বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতিকে ধরে রাখার লড়াই" (সদ্য প্রয়াত চেক ঔপন্যাসিক মিলান কুন্ডেরা) (১৯২৯-২০২৩)

১। ভূমিকা

"স্মৃতি মঞ্জুষা"– আত্মজীবনীমূলক একটি অসাধারণ বই। বইটি লিখেছেন আমার শৈশবকালের প্রধান শিক্ষিকা (দিদিমণি) প্রিয়বালা গুপ্তা। শৈশব থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত সময়ে দিদিমণির জীবনে যা যা ঘটেছে, তার স্মৃতির উপর ভিত্তি করে এ বই রচিত। অন্ধকারাচ্ছন্ন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় স্রোতের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করতে হয় এবং নিজের ভিতরের সম্ভাবনাকে বিকশিত করার জন্য কত কষ্ট করতে হয়, এই বই তারই এক দু:সাহসিক আখ্যান। ১৯৭৩ সনের নভেম্বরে দিদিমণির জীবনাবসান হয়। মৃত্যুর মাত্র এক মাস আগে এই অসাধারণ বইটির লেখার কাজ সম্পন্ন করেন তিনি। সে হিসেবে দিদিমণির জীবনাবসানের ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে। তাঁর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এবং তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই লেখার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বইটি পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার মাধ্যমে আমি এই মহান শিক্ষিকার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

২। 'স্মৃতি মঞ্জুষা': লেখা ও প্রকাশনা প্রক্রিয়া

জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের ধারায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে জীবনের শেষ প্রান্তে (১৯৬০ সনের গোড়ার দিকে) প্রিয়বালা গুপ্তা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। কলকাতা এবং তার আশেপাশে কিছুদিন থাকার পর বীরভূমের সিউড়ীতে সেজ ছেলে রঞ্জন গুপ্তের বাসায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। দিনরাত ঘরসংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকার মানুষ নন তিনি। নিত্যকার কাজ-কর্মের বাইরে কিছু একটা করার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে পড়েন। ছেলে রঞ্জন গুপ্ত একদিন বলে, "মা, তুমি বরং তোমার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে স্মৃতিকথা লেখ। তাতে বর্তমানের ভবিষ্যৎহীন অন্ধকারকে ভুলে ফেলে আসা দিনগুলোর আলোয় উজ্জীবিত হতে পারবে" (স্মৃতি মঞ্জুষা, পৃ: ২৭০)। সাংসারিক নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে এবং নিজের সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি ১৯৬৩ সন থেকে জীবনের স্মৃতিকথা (স্মৃতি মঞ্জুষা) দিদিমণি লিখতে শুরু করেন এবং ১৯৭৩ সনে মৃত্যুর মাত্র এক মাস আগে লেখার কাজ সমাপ্ত করেন।

---

* অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ গবেষক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), ঢাকা। লেখক শৈশবে প্রথম শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত (১৯৫৫-১৯৫৭ সনে) প্রিয়বালা গুপ্তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাধবদী শিশুসনদ বিদ্যানিকেতনের শিক্ষার্থী ছিলেন।

মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পর দিদিমণির সেজ ছেলে অধ্যাপক রঞ্জন গুপ্তের সযত্ন প্রচেষ্টায় 'স্মৃতি মঞ্জুষা' অধ্যাপক অশোক সেনের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে 'বারমাস' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। লেখাটি পাঠকদের আগ্রহ সৃষ্টি করায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববিদ্যা কেন্দ্রের নারী লেখনী প্রকাশন প্রকল্পে প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব উইমেন্স স্টাডিজের সহায়তায় অধ্যাপক রঞ্জন গুপ্তের সম্পাদনায় ১৯৯৯ সনে দে'জ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের মূল্যবান ভূমিকা লেখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী (প্রখ্যাত ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমিয় বাগচীর স্ত্রী)। অধ্যাপক রঞ্জন গুপ্ত মায়ের জীবন নিয়ে "আলোর অভিমুখে: প্রিয়বালা গুপ্তার জীবন ও সময়" শীর্ষক লেখাটি এই বইয়ে সংযোজন করেন। জীবনের নানা সংকটে অগ্নিযুগের বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট নেতা সতীশ পাকড়াশী প্রিয়বালা গুপ্তার অভিভাবকের মতো অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন। প্রিয়বালা গুপ্তাকে লেখা তাঁর কিছু মূল্যবান পত্রাবলি এই বইয়ের পরিশিষ্ট হিসেবে সংযোজিত হয়েছে। পরবর্তীতে দে'জ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা থেকে প্রকাশিত বইটি মো: শাহিনুর মিয়ার সম্পাদনায় ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন পাঠাগারের সহায়তায় অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২০২০ সনে নতুনভাবে প্রকাশিত হয়। প্রিয়বালা গুপ্তার ছেলে মেয়েদের মধ্যে সে সময় কেবলমাত্র ছোট ছেলে পরিমল গুপ্ত ও ছোট মেয়ে মঞ্জুশ্রী সেন শর্মা জীবিত ছিলেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত নতুন বইটিতে তাঁদের অনুভূতি সংযোজিত হয়েছে যা বইটির মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত মূল বইটি হাতের কাছে না থাকায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত বইয়ের উপর ভিত্তি করেই আমাদের বর্তমান পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রিয়বালা গুপ্তা তাঁর আত্মজীবনীতে পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশে) তাঁর যাপিত জীবনের কথা বলেছেন। পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার পর আরও প্রায় ১৫ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। জীবনের শেষ ১৫ বছরের কথা সম্পর্কে খুব অল্পই বলেছেন তিনি। এই বইয়ের সংযোজনীতে অধ্যাপক রঞ্জন গুপ্ত তাঁর মায়ের সমগ্র জীবন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোকপাত করেছেন। পর্যালোচনায় আমরা প্রিয়বালা গুপ্তার আত্মকথার সাথে অধ্যাপক রঞ্জন গুপ্তের পর্যবেক্ষণ এবং সতীশ পাকাতালীর পত্রাবলি (যা এই বইয়ে সংযোজিত হয়েছে) একত্র করে সমগ্র বইয়ের উপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের প্রয়াসী হবো।

৩। প্রিয়বালা গুপ্তার জীবন সংগ্রাম: একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ

৩.১। প্রিয়বালা গুপ্তার পিত্রালয় ও শৈশব জীবন

'স্মৃতি মঞ্জুষা' এবং তার সাথে সংযোজিত রঞ্জন গুপ্তের নিবন্ধ থেকে প্রিয়বালা গুপ্তার জন্মের সন-তারিখ স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে এটা জানা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার সময়ে ১৩ বছর বয়সে প্রিয়বালা দেবীর বিয়ে হয়। ১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়, সে হিসেবে তার জন্ম হয় ১৮৯৮ সনে। রঞ্জন গুপ্তের নিবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি, প্রিয়বালার জন্ম হয়েছিল জন্মাষ্টমীর রাতে। জন্মাষ্টমী সাধারণত ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে (সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে) হয়ে থাকে। তাই ঘটনা পরম্পরায় (পরোক্ষভাবে) এ কথা বলা যায় যে, ১৯৯৮ সনের সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে প্রিয়বালা দেবীর জন্ম হয়। বাদলা দিনে তাঁর জন্ম হয় বলে তাঁর ডাকনাম ছিল বাদলী। বড়রা তাকে বাদলী বলেই ডাকতেন।

প্রিয়বালা গুপ্তা তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর পিতৃবংশ, পিত্রালয় এবং গ্রাম সমূহের ("গুচ্ছগ্রাম") ঐতিহাসিক ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বিবরণ থেকে আমরা জানতে

পারি, পিতৃকুলের বংশ মর্যাদায় তাঁরা (কায়স্থ/বৈদ্যবংশীয়) সাধারণভাবে শিক্ষা দীক্ষায় ও আর্থিক সামর্থ্যে ছিলেন উন্নত। এঁদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ছিল জমিদার-তালুকদার, নামজাদা কবিরাজ, উচ্চপদস্থ চাকুরিজীবী ইত্যাদি। বর্ণগত সংহতি ও একাত্মতা এঁদের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে সহায়তা করে। প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে এঁরা স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় লোকদের কাছে 'মাথার মনি' হিসেবে বিবেচিত হন। ঐতিহাসিকভাবে এঁরা প্রভূত ভূসম্পত্তির মালিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে সময়ের বিবর্তনে এঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার প্রকৃত উৎস ছিল উন্নততর শিক্ষা-দীক্ষা ও সরকারি উচ্চ পদমর্যাদা। প্রিয়বালা দেবীর জন্ম হয় রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে। তাঁর বাবা পাঁচদোনা নিবাসী ইন্দুভূষণ সেন ছিলেন বাবা-মার একমাত্র সন্তান। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই দেড়-দু'মাইল দূরের ভাটপাড়া গ্রামে পিসিমা ও পিসেমশাইয়ের কাছে পিতৃ-মাতৃ স্নেহে পালিত হন। স্যার কে.জি গুপ্ত ছিলেন তাঁর আপন পিসতুতো ভাই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অবস্থাপন্ন এই ব্রাহ্ম পরিবারের সংস্পর্শে এসেও বিলাসিতা, বড়লোকি চালচলন এবং আদব-কায়দা প্রিয় বালা দেবীর বাবাকে স্পর্শ করেনি। তিনি ছিলেন সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ, তবে চিন্তাভাবনায় ছিলেন উদার, প্রাজ্ঞ ও সুদূরপ্রসারী। ব্রাহ্ম পরিবারে আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত হয়েও তিনি ব্রাহ্ম হননি। নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য তিনি হিন্দুই থেকে গেলেন। হিন্দু হলেও হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি তাঁকে স্পর্শ করেনি। তিনি হিন্দু দেব দেবীর মন্দিরে যেতেন না, ব্রাহ্ম না হয়েও ব্রাহ্ম সংগীত গাইতেন এবং উপাসনা করতেন। অর্থাৎ হিন্দু হয়েও তিনি ব্রাহ্ম সংস্কৃতি ধারণ করেছেন। এ যেন এক বিচিত্র হিন্দু! বাবা ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে উদার হলেও মা লক্ষ্মীময়ী উল্টো ভাবধারার মানুষ। মা ছিলেন গোড়া শাক্ত পরিবারের মেয়ে—ধর্মীয় রক্ষণশীলতায় এবং আচার আচরণে যেন "হিন্দুয়ানীর" এক চরম পরাকাষ্ঠা।

পিসিমা-পিসেমশায়ের সহায়তায় উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজের দায়িত্ব ও আত্মমর্যাদা বোধের কারণে তিনি তাঁদের উপর আর্থিক বোঝা হয়ে থাকতে চাননি, তাই কম বয়সে অল্প বেতনে আবগারি বিভাগে চাকুরিতে ঢুকে গেলেন।

আবগারি বিভাগের সরকারি চাকুরি ছিল বদলিযোগ্য। ইন্সপেক্টর পদে তিনি প্রথমে ভাগলপুরে যোগদান করেন। এই ভাগলপুরেই প্রিয়বালা দেবীর জন্ম। বাবার চাকুরিসূত্রে বাবার সাথে বিভিন্ন জায়গায় তাঁর থাকার সুযোগে জীবনে ছোটবেলা থেকেই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তিনি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন। ভাগলপুর, কটক, পুরী, কোন্নগর, রাঁচি ও কলকাতায় বাবার চাকুরির প্রয়োজনে থাকার সময় ছোটবেলায় (বার-তের বছর বয়সে) শহর-গ্রামের কত কথাই না তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। এত অল্প বয়সে এত খুঁটিনাটি কথা এত স্পষ্ট করে কারো মনে থাকার কথা নয়। অথচ তিনি সেই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বিশেষত ভাগলপুর ও কটকে মিশনারিদের সেই স্কুল, তাদের পাঠক্রম, পঠন-পাঠন, পদ্ধতি ও শৃঙ্খলাবোধ এবং সাংস্কৃতিক জীবন কী নিখুঁতভাবেই না ফুটে তুলেছেন তাঁর স্মৃতি কথায়। চিন্তায় এবং চেতনায় অসাধারণ সংবেদনশীল ছিলেন বলেই এতদিন পরও পুরোনো সেইসব দিনের কথা এত সুন্দর ও সুললিত ভাষায় আত্মজীবনীতে সুবিস্তৃত বিবরণ দিতে পেরেছেন।

ভাগলপুর ও কটকের স্কুল জীবনের স্মৃতি সারাজীবনই প্রিয়বালা দেবীকে পীড়া দেয়। স্কুলে সাধারণত তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। শৈশব থেকেই মনোযোগী ছাত্রী ছিলেন। স্কুল-কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর। বাবা ইন্দুভূষন সেন মুক্ত মনের অধিকারী হয়েও সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য মেয়ের বাল্যবিবাহে সম্মত হতে বাধ্য হন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। ফলে প্রিয়বালা দেবীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ছেদ পড়ে। শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হয়ে তিনি তাঁর বাবাকে অভিমান

করে বলেছিলেন, "বাবা, মেয়ে বলেই তুমি আমাকে পড়াতে চাইলে না। ছেলে হলে বোধ হয় আমার শিক্ষার জন্য বিলাত পাঠাতে।" মেয়ের বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া বাবা ইন্দুভূষণ বাবুর যেন আর কিছুই করার ছিল না।

৩.২। প্রিয়বালা গুপ্তার শ্বশুরালয়: জীবন ও কর্ম

৩.২.১। মাধবদী অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ও সমাজ বিন্যাস

বিয়ের পর বিদ্যালাভের বঞ্চনা নিয়ে নিজের মনে নতুন আশা ও স্বপ্ন সঞ্চিত করে প্রিয়বালা দেবী শ্বশুর বাড়িতে ঢুকলেন। শ্বশুর বাড়ি মাধবদী। খুবই ছোট গ্রাম। চার ঘর বৈদ্য, চার-পাঁচ ঘর ব্রাহ্মণ, পাঁচ ঘর সিং বা কায়স্থ আর দুই/তিন ঘর ধোপা/নাপিত। শ্বশুর বাড়ির পিতৃপুরুষের ঐতিহাসিক পটভূমি, গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান, জীবন-জীবিকার ধরনসহ আর্থসামাজিক বিন্যাসের সবিস্তৃত বিবরণ প্রিয়বালা দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে দিয়েছেন।

জানা যায়, প্রিয়বালা দেবীর শ্বশুর বাড়ির আদি নিবাস ছিল যশোরে কোনো এক গ্রামে। সময়ের বিবর্তনে নানা স্থান পরিবর্তন করে তাঁরা শেষ পর্যায়ে বসতি স্থাপন করলেন ব্রহ্মপুত্রের একটি খালের ধারে মাধবদী গ্রামে। এককালে জায়গাটা নদী গর্ভ থেকে চর হিসাবে জেগে উছেছিল। প্রমাণস্বরূপ, মাধবদী সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামের নাম উল্লেখ করা যায়, যেমন উত্তর দিকে শেখের চর, দক্ষিণে কোতোয়ালীর চর এবং অদূরে গদাইরচর গ্রাম। ব্রহ্মপুত্র তার প্রচলিত নাম বজায় রাখলেও বর্ষা মৌসুম ছাড়া অন্য প্রায় সব সময়ে এটি ছিল কচুরীপানায় ঢাকা একটি শীর্ণ খাল মাত্র। গ্রামের পূর্ব দিকে বিস্তৃত বট গাছটিকে বাঁ দিকে রেখে ৩/৪ মাইলব্যাপী ফসলি (মূলত ধান, পাট) মাঠ এবং বিক্ষিপ্ত গোটা কয়েক গ্রাম পেরুলেই চোখে পড়ত প্রবল স্রোতে প্রবাহিত ভয়ংকর মেঘনা নদী যা ছিল উত্তর-দক্ষিণে আদিগন্ত প্রসারিত।

গোড়ার দিকে তিন জ্ঞাতি বাড়ির মধ্যে প্রিয়বালা দেবীর শ্বশুর বাড়ির অবস্থাই ছিল আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে উন্নত। তাদের বেশ কিছু জমিদারি মহাল ছিল যার অধিকাংশ বৈধ-অবৈধভাবে প্রতিবেশী মুন্সিবাড়ীর হস্তগত হয়। এই মুন্সীবাড়ী জমিদারির অর্থ ও তাঁতিদের হাটের খাজনা থেকে ক্রমশ প্রভূত অর্থের মালিক হয়ে "বাবু বাড়িতে" উন্নীত হয়। তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি এতটাই বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই গ্রাম ও অঞ্চলের মাথা হয়ে উঠেন। গ্রামের বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, সিং, নাপিত ও বাজারের ব্যবসায়ীদের নিয়ে গঠিত ছোট্ট গ্রাম-সমাজটিকে শাসনে রাখতে কোনো অসুবিধা তাঁদের হতো না। কুচক্রীদের হাতে পড়ে এই বাবু বাড়ির সন্তান সতী প্রসন্ন গুপ্ত রায় প্রথমে উন্মাদ হয়ে যান এবং পরে আত্মহত্যা করেন। তাঁর নাবালক ছেলেরা তাদের মায়ের যত্নে ও অভিভাবকত্বে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে অনেক সংস্কার ও জনকল্যাণমূলক কাজে হাত দেন। উদাহরণস্বরূপ, সতী প্রসন্ন এম.ই. (মিডল ইংলিশ) স্কুল জমিদার ছেলেরাই তাঁদের বাবার নামে প্রতিষ্ঠা করেন যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সনে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এই বিদ্যালয়টির বর্তমান নাম মাধবদী সতীপ্রসন্ন (এস.পি.) ইন্সটিটিউট যা এতদ্ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের প্রাণকেন্দ্র এবং এতদ্ অঞ্চলে শিক্ষিত সমাজ গঠনে যার অবদান অনস্বীকার্য। এই বাবুর বাড়ি এবং বাবুর হাটের চিত্তাকর্ষক বিবরণ আমরা প্রিয়বালা গুপ্তের আত্মজীবনী থেকে সুবিস্তৃত জানতে পারি।

৩.২.২। শ্বশুরালয়: প্রিয়বালা গুপ্তার জীবন সংগ্রাম

উপরিউক্ত ভূপ্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে প্রিয়বালা দেবী গৃহবধূ হিসেবে প্রবেশ করলেন ঘোরতর শাক্ত ও নানান কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক রক্ষণশীল পরিবারে। স্বামী যতীন্দ্র মোহন গুপ্ত রায় ছাড়া স্কুল-কলেজের লেখাপড়া কারো ছিল না। সাধারণ পড়াশুনার প্রতিও কারো আগ্রহ ছিল না। এমন পরিবেশে বাল্য বধূ হিসেবে এসে প্রিয়বালা দেবী হতাশ হয়ে পড়লেন। তেরো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যা কিছু শিখেছেন তা যেন ব্যর্থ হয়ে গেল!

না, তাঁকে ব্যর্থ ও হতাশ হলে চলবে না। এমন অবস্থার মধ্যেও বাঁচার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য তিনি নিজের মনের গভীরে সৃষ্টি করলেন এক স্বতন্ত্র জগৎ- তাঁর কাব্যচর্চা, লেখাপড়া ও চিন্তাভাবনার জগৎ। ছোটবেলাতে বাবার উৎসাহে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন তিনি। মাত্র সাত-আট বছর বয়সে 'ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া' নামে তাঁর একটি কবিতা সেকালের 'মহিলা' পত্রিকাতে ছাপা হয়েছিল। আবার শুরু করলেন নীরবে নিভৃতে স্বরচিত কবিতা লেখা। পাশাপাশি সাহিত্যের অন্যান্য বইপড়া ও নিয়মিত পত্রপত্রিকা পড়া। না পাওয়ার যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার এইতো প্রকৃষ্ট উপায়।

গ্রামের কয়েকটি নিরক্ষর মহিলা প্রিয়বালা দেবীর কাছে আসতো স্বামীদের চিঠির জবাব লিখে দেবার জন্য। প্রথম দিকে তিনি জবাব লিখে দিতেন, যদিও তাঁর জন্য এটা ছিল খুবই অস্বস্তিকর। ভাবলেন, সামান্য লেখাপড়া এদের শিখিয়ে দিলে নিজের মনের কথাটাতো তারা নিজেরাই লিখতে পারবে এবং এটা তাদের জন্য কতই না আনন্দকর হয়ে উঠবে। তাই প্রতিদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তাদের লেখা-পড়া শেখাতে তিনি লেগে গেলেন এবং তাদের সাথে গল্পে গুজবে তাঁর নি:সঙ্গ নিরানন্দ জীবন আনন্দময় হয়ে উঠলো। জীবনে এটা তাঁর স্মরণীয় ঘটনা যা পরবর্তীতে মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য স্কুল-স্থাপনের মহড়া হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এলাকায় মেয়েদের স্কুল ছিল না। তাদের স্কুলে পড়াবার জন্য মা-বাবাদের কোনো চিন্তা বা আগ্রহ ছিল না। অবস্থাপন্ন প্রতিবেশী (আইনজীবী) প্রকাশ পাকড়াশীর বড় ছেলে বেনু পাকড়াশীর (বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র) আগ্রহ ও অনুপ্রেরণায় গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রিয়বালা দেবীর পরিচালনায় গ্রামের মেয়েদের জন্য স্কুল খুলতে রাজি হলেন। স্কুল হবে অবৈতনিক। মুষ্টি ভিক্ষার চাল বিক্রি করে মেটানো হবে স্কুলের যাবতীয় খরচ। ১০/১২ জন মেয়ে নিয়ে স্কুল শুরু হলেও কিছুদিন পর মা-বাবাদের আগ্রহের অভাবে এবং মুষ্টি ভিক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়ার স্কুল বন্ধ হয়ে যায়।

মেয়েদের শিক্ষাদানের কথা প্রিয়বালা দেবী সব সময়ই ভাবতেন। নিজের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, যতদিন পর্যন্ত না মায়েরা সচেতন হয়ে শিক্ষার মর্ম বুঝতে পারবেন, ততদিন তারা মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হবেন না। তাই প্রাথমিক কাজ হলো দেশ, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে মায়েদের সচেতন করা। প্রিয়বালা দেবী কর্তৃক এহেন প্রচেষ্টার কথা অবশ্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যা তাঁকে মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার দিকে আগ্রহী করে তুলে।

পাশের গ্রামের কাশীপুরের এক নিরক্ষর গৃহিণী নিজের মেয়ে শৈলবালাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য প্রিয়বালা দেবীর দ্বারস্থ হন। এবার তিনি এই গৃহিণীর অনুরোধ রাখতে এগিয়ে আসেন এবং পুনরায় স্কুল খুলতে মনস্থির করলেন। এবার স্কুল খুললেন নিজের চেষ্টায়। নিজেই হলেন স্কুলের একক শিক্ষিকা-পরিচালিকা। আর স্কুল হবে বৈতনিক। তাঁর ধারণা, অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা এবং অভিভাবক কারো কোনো দায়িত্ববোধ থাকে না। অন্যদিকে স্কুল বৈতনিক হলে, শিক্ষক ভাববেন পয়সা নিচ্ছেন তাই তিনি

ছাত্রীদের পড়াতে বাধ্য। অভিভাবক ভাববেন, মেয়েদের পড়াশুনার জন্য পয়সা খরচ হচ্ছে, বিনিময়ে সঠিক উপকার হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। উভয়দিকে উৎসাহ ও দায়িত্ববোধের ফলে মেয়েদের শিক্ষা লাভের অগ্রগতি হবে এবং স্কুলের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে।

এই ধরনের চিন্তার বশবর্তী হয়ে প্রিয়বালা এবার উঠে পড়ে লাগলেন স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। গ্রামের মহিলাদের বাড়িতে ডেকে এনে নিজের পরিকল্পনার কথা খুলে বললেন। এবার তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় মাধবদী ও আশেপাশের গ্রামে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে সমাজের একাংশের ভিতর কিছুটা অন্তত চেতনার সঞ্চার হলো এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করতে আরম্ভ করলো।

নিজের মেয়ে আরতি ও কাশীপুরের শৈলবালা – এই দুইজনকে নিয়ে মাধবদী শিশুসদন বিদ্যানিকেতন শুরু হয় ১৯৪৪ সনের গোড়ার দিকে। বাড়ির বৈঠকখানা স্কুল ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাধবদী এম.ই. স্কুলের প্রধান শিক্ষক আনন্দী গ্রামের শচীনন্দন সাহা স্কুল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন এবং স্কুলের পরিকাঠামো সৃষ্টিতে মেরামতযোগ্য তিনটি বেঞ্চ ও কিছু সংখ্যক আসবাবপত্র দিয়ে সহায়তা করলেন।

প্রাথমিকভাবে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত এবং কেবলমাত্র মেয়েদের নিয়ে স্কুল চালু করার প্রস্তাব ছিল। পরবর্তীতে মেয়েদের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এবং ছেলেদের চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রথম দিকে পাঁচটি মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই সংখ্যাটি দেড়শ ছাড়িয়ে যায়। মাধবদী ছাড়া ছাত্র/ছাত্রীরা প্রধানত এসেছিল আটপাইকা, কোতোয়ালীরচর, কাশীপুর, আলগী, নওপাড়া, বিরামপুর, ভগীরথপুর, শেখেরচর ও আনন্দী গ্রাম থেকে। স্কুল থেকে এসব গ্রামের দূরত্ব এক থেকে দেড় মাইলের মধ্যে। উচ্চবর্গের হিন্দু পরিবার থেকে ছাত্রীরা ছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বৈশ্য সাহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে ছিল পশ্চাৎপদ। মুসলমান পরিবার থেকে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। পড়ুয়াদের তালিকায় যখন ছিল সর্বোচ্চ ১৫০ জন, তখন মুসলমান পরিবার থেকে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ জনের মতো।

পড়াশুনা, খেলাধুলা ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব মিলিয়ে স্কুলের পরিবেশ ছিল আন্তরিকতায়পূর্ণ এবং আনন্দঘন। মাধবদী এলাকার নানা সীমাবদ্ধতা ও পশ্চাৎপদতা থাকা সত্ত্বেও এই স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ এলাকায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও অগ্রগতি হয়েছিল যার ফলস্বরূপ ঘুমভাঙ্গা নবজাগরণের কিছু লক্ষণ এখানে পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই সীমিত নবজাগরণে শিক্ষিকা ও সমাজসেবিকা প্রিয়বালা গুপ্তার অবদান অনস্বীকার্য।

এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার সুফল তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় না – সুফল প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে যায় যার জন্য দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে হয়। প্রিয়বালা দেবীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের মাধ্যমে অবশ্যই এই সুফল ছড়িয়ে গিয়েছে। মাধবদীর পাশের গ্রাম নওপাড়ার মেয়ে এক খালেদা আকতার খানমের কথা প্রিয়বালা দেবীর আত্মজীবনীতে উল্লেখ আছে। খালেদা তাঁর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের আপত্তি ও নিন্দা অগ্রাহ্য করে দিদিমণির স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন এবং পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে কলেজের অধ্যাপিকা হয়েছিলেন। তিনি দিদিমণির সাথে যোগাযোগ রেখেছেন এবং নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে দিদিমণির অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেছেন।

আজও বাংলাদেশের আনাচেকানাচে প্রিয়বালা গুপ্তার অনেক ছাত্র-ছাত্রী খুঁজে পাওয়া যাবে যাঁরা তাঁর বিদ্যানিকেতনে শিক্ষা লাভ করে উপকৃত হয়ে পরবর্তী জীবনে স্কুল, কলেজ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষক, ডাক্তার, গবেষক ও সরকারি চাকুরিজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। শৈশবে দিদিমণির বিদ্যানিকেতনের শিক্ষার্থী হিসেবে আমি নিশ্চিত, তাঁদের সকলের কাছে তিনি একজন মহীয়সী হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

প্রিয়বালা শিক্ষা বিস্তারেই শুধু নিজেকে ব্যস্ত রাখেননি। তিনি স্বশিক্ষা প্রক্রিয়ায় বিদ্যাচর্চায় সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। স্কুল-কলেজের কোনো আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি তাঁর না থাকলেও বিদ্যার্জনে কখনও তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। ১৯৪৭ সনে বিশ্বভারতীর লোক শিক্ষা সংসদের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয় মাধবদী গ্রামে। পঞ্চাশোর্ধ বয়সে সেই কেন্দ্রের অধীনে যথাক্রমে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি "সাহিত্যভারতী" উপাধি লাভ করেন।

প্রিয়বালা দেবীর কর্মযজ্ঞের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ধাতৃবিদ্যা শিক্ষা ও তার নিয়মিত প্রয়োগ। সম্ভ্রান্ত পরিবারের পুত্রবধূর পক্ষে এ কাজ মোটেও সহজসাধ্য ছিল না। এই মহান কাজের তাৎক্ষণিক ফলস্বরূপ মাধবদী এলাকায় নবজাত শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার অনেক কমে এসেছিল। স্থানীয় জনপ্রিয় চিকিৎসক ডা: বীরেশ্বর পাল এ কাজে তাঁকে প্রত্যক্ষ সহায়তা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন যার সুবিস্তৃত বিবরণ "স্মৃতি মঞ্জুষা" তে বিধৃত হয়েছে।

তাছাড়া পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় (১৯৪৩ সনে) এলাকায় লংগরখানা চালু করে ভুখা মানুষের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন। গোটা এলাকাতে মানুষের দুর্যোগে দিনরাত তিনি তাদের পাশে থেকে খাদ্য ও বস্ত্রদানের মাধ্যমে তাদের সহায়তা করেছেন। এছাড়া তিনি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্য ছিলেন। মহিলাদের অধিকার রক্ষার্থে বাবুর বাড়ির এক বিধবা বিবাহের আয়োজন করতেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। এসব জনহিতকর কাজে তিনি অগ্নিযুগের বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট নেতা সতীশ পাকড়াশী, সতীন্দ্র রায় ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নরসিংদী কমিটির সম্পাদিকা হিরন বালা রায়ের প্রত্যক্ষ সহায়তা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ থেকে এ কাজে তিনি প্রবল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন। এমনকি তাঁর এই সব কাজের জন্য তাঁর পরিবারকেও "এক ঘরে" করে রাখা হয়। এতদসত্বেও কোনো মহান কাজেই তিনি পিছপা হননি। অগ্নিযুগের মহান বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা সতীশ পাকড়াশী এই সব কাজে বাধা ও সামাজিক নির্যাতনের মুখে তাঁকে উপদেশ দেন, "ও সব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। তারা অন্ধকারের জীব, আলোকে ভয় পায়। আপনি নিজের বিশ্বাসে শক্ত থাকুন, দেখবেন একদিন জয় আপনার হবেই হবে।" আজীবন আলোর পথে দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক হিসেবে তিনি প্রিয়বালা দেবীকে অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন (সতীশ পাকড়াশীর পত্রাবলি দ্রষ্টব্য, স্মৃতি মঞ্জুষা, পরিশিষ্ট, পৃ: ২৮১-৩০৫)। এখানে উল্লেখ্য, সতীশ পাকড়াশী এবং সতীন্দ্র রায়ের মতো তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলত কবি, শিক্ষাবিদ ও মানবতাবাদী। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাধবদী শিশুসদন বিদ্যানিকেতন বিশ্বভারতীয় শান্তি নিকেতনের ধারায় তিনি পরিচালনা করেন। কবিতা ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় পড়াশুনা ও লেখালেখির কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ১৯৪২ সনে ঢাকা রেডিওতে তাঁর লেখা 'শকুন্তলা' নামক গীতিনাট্য এবং পরের বছর 'শরবরীর প্রতীক্ষা' ও 'ঊর্মিলা' নামে আরও দুইটি গীতিনাট্য যথারীতি গৃহীত ও সম্প্রচারিত হয়।

৩.৩। জীবনের শেষ কথা ও অনুভূতি

সর্বনাশা ভারত/বাংলা বিভাগ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতৃভূমি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে এলেন তিনি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মাধবদী এলাকার মানুষের প্রতি আন্তরিক

ভালোবাসার টানে তাদের কাছে ফিরে আসার বড় সাধ ছিল তাঁর। কিন্তু ফিরে আসা তো আর সম্ভব নয়। বিদায় বেলায় বিচ্ছেদের ভারাক্রান্ত মনে কবিতার ছন্দে রেখে যান এক শোকগাথা:

"আমার জীবন সন্ধ্যা নেমেছে
বন্ধ্যা হয়েছে দিন,
প্রাণ-দেউলের সোপানের 'পরে
বাজে বিদায়ের বীণ।

ঝরা বকুলের অন্তিম শ্বাসে
চৈতী দিনের শেষে
কত অকথিত বেদনার বাণী
ধূলায় রহিল মিশে।"

('স্মৃতি মঞ্জুষা', পৃ. ১৫৬)

৪। উপসংহার

উপরি উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয়বালা গুপ্তার 'স্মৃতি মঞ্জুষা' নিম্নে বর্ণিত কারণে একটি অসাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত:

১. পরিবার, নিজস্ব গ্রাম বা ছোট গোষ্ঠী এবং বিশেষ অঞ্চলের চৌহদ্দির মধ্যে একজন নারী পিতৃতান্ত্রিক অসম সমাজ ব্যবস্থায় নানা বাধা অতিক্রম করে কীভাবে তাঁর আত্মমর্যাদা ও সমাজ চেতনা বিকাশ লাভে সার্থক হতে পারেন, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো এই বই।

২. মেয়েদের সক্ষমতার স্বরূপ সন্ধানে এই আত্মজীবনী বিগত শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের এক অমূল্য আকর গ্রন্থ (আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে) হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৩. এই অমূল্য গ্রন্থ সর্বগ্রাসী বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতিকে ধরে রাখা এবং অম্লান করে রাখার এক আপ্রাণ প্রয়াস।

৪. এই বই পড়ে পাঠক (বিশেষত মাধবদী শিশুসদন বিদ্যানিকেতনের প্রাক্তনীগণ) বিস্মৃত অতীতকে নতুন করে অনুভব করতে পারবেন এবং শিকড়ের সন্ধানে আত্মনিয়োগের অনুপ্রেরণা পাবেন।

অতএব বইটি অবশ্য পাঠ্য এবং এর বহুল প্রচার কাম্য। বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য এই বইয়ের প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ প্রকাশ এবং সম্পাদনার জন্য যথাক্রমে অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা ও ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পাঠাগারের সভাপতি মো: শাহীনুর মিয়ার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। মুদ্রণ প্রমাদ এবং একই পরিচ্ছেদ একাধিকবার উল্লেখজনিত ত্রুটি (দেখুন পৃ. ২৪৬,২৫৪,২৬৪) দূর করার জন্য বইটির সংশোধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন বলে মনে করি।

আলোচিত বই

প্রিয়বালা গুপ্তা, *স্মৃতি মঞ্জুষা* (সম্পাদন: মো: শাহিনুর মিয়া, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পাঠাগার), অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, বইমেলা ২০২০।

বিশেষ ক্রোড়পত্রঃ স্বাধীনতার ৫০ বছর